নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারবিষয়ক মতবিনিময় সভা

নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রস্তাবনা নিয়ে ৫ আগস্ট প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে বাম গণতান্ত্রিক জোটের মতবিনিয় সভা

৫ আগস্ট '১৮ ভোটাধিকার নিশ্চিত এবং বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রস্তাবনা নিয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোট কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভার শুরুতে ২৯ জুলাই শহীদ রমিজউদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের দুই শিক্ষার্থী রাজীব ও দিয়াসহ এ সময়কালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। নিরাপদ সড়কের দাবিতে চলমান ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সড়কে নৈরাজ্যের অবসান, পরিবহন খাতে মাফিয়াতন্ত্রের অবসান, মন্ত্রী শাহজাহান খানের অপসারণ দাবি করা হয়। সারাদেশে আন্দোলনরত স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হেলমেটধারী হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করা হয়।

জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে জোটের সমন্বয়ক ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক, সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়জুল হাকিম লালা, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য ফিরোজ আহমেদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা আলমগীর হোসেন দুলাল, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, নয়াগণতান্ত্রিক গণমোর্চার আহ্বায়ক জাফর হোসেন প্রমুখ।

উত্থাপিত মূল প্রবন্ধে ১৬ দফা সুপারিশমালায় বলা হয়, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে সংসদ ভেঙে দিতে হবে এবং রাজনৈতিক দল ও সমাজের অপরাপর অংশের মানুষের মতামত নিয়ে 'নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তদারকি' সরকার গঠন করতে হবে। ব্যর্থ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে, জাতীয় সংসদে 'জাতীয়ভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। সকল নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশিশক্তির ব্যবহার, প্রশাসনিক কারসাজি, সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির যেকোন অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। প্রার্থীদের জামানত হ্রাস করতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে ভোটার তালিকার সিডি ক্রয়ের বিধান প্রত্যাহার করতে হবে। নির্বাচনী ব্যয় ৩ লাখ টাকার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

কমরেড সাইফুল হক : বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে অভিনন্দন।

তিনি বলেন, আমরা এখন সংকটময় পরিস্থিতি অতিক্রম করছি। নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছে, দেশের মানুষ এতে সমর্থন দিয়েছে, কোটা সংস্কার আন্দোলনেও শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমেছিলো এবং আন্দোলনকারীদের ওপর শাসক দলের ছাত্র-যুব সংগঠনের দমন-পীড়ন-হামলা-মামলার ভয়াবহতা আপনারা দেখেছেন।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : আওয়ামী দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে হবে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র দ্বি-দলীয় ধারার বাইরে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আমরা আন্দোলনের প্রয়োজনে নির্বাচন করতে পারি; আবার প্রয়োজনে নির্বাচন বয়কটও

করতে পারি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, ছাত্রদের ৯-দফা মেনে নিন নাহলে ৯-দফা ১-দফায় পরিণত হবে। তিনি আরও বলেন, মন্ত্রীসভা থেকে শাহজাহান খানকে অপসারণ করেন, নাহলে আপনাকেও ক্ষমতা ছাড়তে হবে।

ড. শাহদীন মালিক : আপনাদের উত্থাপিত ১৬ দফা প্রস্তাবনা অনেক বিস্তৃত, এর সাথে দ্বিমত করার কিছু নেই। একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এর প্রত্যেকটাই দরকার। আপনারা অনেক দিন ধরে যে কথাটি বলছেন, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন, এই বিষয়টা অন্যদের সাধারণত আলোচনায় খুব বেশি আসে না। আমিও মনে করি এটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় আপনাদের ১৬ দফা দাবির মধ্যে কিছু দাবিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামনে আনতে হবে, এক বারেই তো সরকার সব দাবি মেনে নিবে না। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা আর ৫৮টা ধারা জনগণের দৃষ্টিগোচর করা মুশকিল।

সংবিধানে অনেক কথা বলা আছে; যেমন সরকারের মেয়াদ কত দিন হবে। সেখানে দুটা বিকল্প আছে। একটা হলো সরকার যেদিন গঠিত হয়েছে, সেদিন থেকে পুরো পাঁচ বছর মেয়াদে সে ক্ষমতায় থাকবে এবং ৫ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে। অন্যটা হলো সংসদ যে কোন সময় অর্থাৎ মেয়াদ পূর্তির আগেও ভেঙে দেওয়া যাবে। তা হলে প্রথমটাই আমরা ধরে নিচ্ছি কেন? এই বিষয়টা আমরা খুব বেশি খেয়াল করি না। মেয়াদ পূর্তির আগে সংসদ ভেঙে দিলে একটা অগ্রগতি হবে যে, বর্তমান সাংসদরা সংসদ সদস্য হিসাবে থাকা অবস্থায় নির্বাচন করবে না। তখন ভেঙে যাওয়া সংসদের সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীসভা গঠন করা যাবে। এটা সংবিধানের আওতায় করা যাবে।

সংবিধানে বলা আছে আইন করে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। তা হলে এখন যে নির্বাচন কমিশন আছে তাকে ভেঙে দিয়ে সংসদে আইন করে নতুন নির্বাচন কমিশন করা যাবে; সে দাবি তোলা যায়। এটা পরিষ্কার যে এই নির্বাচন কমিশন গত দুই বছর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে তাতে তারা দেশ-জাতি কারো আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তারা এতটুকু আস্থা অর্জন করেছে–যে কোনভাবে সরকারের জয় নিশ্চিত করবে। আমাদের ১০টা জাতীয় নির্বাচন হয়েছে, এর মধ্যে ১৯৭৩ আর ২০১৪ হয়েছে আওয়ামী লীগের অধীনে। ফলাফল কী হয়েছে আমরা জানি। '৭৯ আর '৯৬-র ১৫ ফেব্রুয়ারি হয়েছে বিএনপি'র অধীনে। দুটারই ফলাফল একই। ১৯৮৬ ও ৮৮ সালে হয়েছে জাতীয় পার্টির অধীনে, ফল একই। এই ছয়টা নির্বাচন হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে। এগুলোর ফলাফল দেখলে যে কেউ বলে দিতে পারে দলীয় সরকারের অধিনে নির্বাচন হলে আগামী নির্বাচনের ফলাফল কী হবে–এর জন্য বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির দরকার নেই, পণ্ডিত হওয়ারও দরকার নেই। এই সরকারের শাসনামলে এমন কিছু ঘটে নাই যে আমরা বলতে পারবো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেও ফলাফল ভিন্ন হবে। নির্বাচনের ফলাফলের জন্য আমাদের টেলিভিশনের সামনে রাত জেগে বসে থাকতে হবে না। যদি আমরা ভিন্ন ফলাফল আশা করি তার জন্য নতুন করে আইন করে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। বর্তমান কমিশন আইন ছাড়াই গঠিত হয়েছে। তার দক্ষতা, যোগ্যতা, সততা নিয়ে মানুষের ব্যাপক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বাছাই কমিটিতে প্রধান বিচারপতি থাকতে পারবে না, তাঁকে বাদ দিয়ে করতে হবে। কারণ বর্তমান প্রধান বিচারপতি গত দুটি নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বাছাই কমিটির প্রধান ছিলেন। তার ফলাফল কী আমরা দেখেছি।

নির্বাচনে প্রার্থীর ব্যয় এবং প্রার্থীর সম্পদের হলফ নামায় যে বিবরণী দাখিল করবেন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের পরেও সেটার যাচাইবাছাই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখবেন। সবার বিবরণী না দেখলেও অন্তত পক্ষে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরটা তো যাচাইবাছাই করতে পারেন। কোন আপত্তি পাওয়া গেলে নির্বাচন কমিশন একটা সুষ্ঠু তদন্ত করে গরমিল পেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। এগুলোর ওপর খুব জোর দিচ্ছি কারণ এগুলো এখনই বাস্তবায়ন সম্ভব।

সরকারের কোন কাজেই কারও আস্থা নেই, কীভাবে থাকবে। ২০০২ সাল থেকে শুরু হলো–আমরা দেখলাম মানুষকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর পরদিন সে হার্ট এ্যাটাকে মারা গেলো। তার পর একই ঘটনার নতুন নাম হলো বন্দুকযুদ্ধ, ক্রশফায়ার। একটা বাহিনী ১৬ বছর ধরে বিনা বিচারে মানুষ মেরে মিথ্যা কথা বলে চলছে, তো এদের কথা কে বিশ্বাস করবে। মন্ত্রীরা যখন কথা বলছেন বিশ্বাস করার মতো কথা কেউই বলছে না।

পরিবহনের নতুন আইন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু ৮৩ সালের আইনের কী সমস্যা হয়েছিলো। নতুন আইন হলে তো নতুন মামলা হবে। নতুন আইন করলে এর বাস্তব প্রয়োগ হতে বেশ সময় লাগে। মাদকের জন্য ২ লাখ মামলা আছে আর বিচারকের সংখ্যা সব মিলে ১ হাজার ৬ শ। মাদকের জন্য হয়তো ৪ শ হবে। আমি হলফ করে বলতে পারি আগামী ২০ বছরে ২ হাজার মামলারও নিষ্পত্তি হবে না। বছরে আমাদের অন্তত ৩০টা নতুন আইন হয়, নতুন আইনের জন্য নতুন বিচারক লাগে। নতুন আইনের নতুন ধরনের অপরাধ থাকে, একই পুলিশ ইনসপেক্টরকে তদন্ত করতে হবে, ৩০টা নতুন আইন তাকে বছরে শিখতে হবে, মামলা লিখতে হবে, মামলা কোর্টে নিতে হবে। প্রতি বছর ৩০টা নতুন আইন তাকে শিখতে হলে আইনে অন্তত মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হতে হবে। বিচারককে শিখতে হবে, আইনজীবীকে শিখতে হবে। ফলে এই বিষয়গুলো একটু কল্পনা করে দেখুন তো কী করে এই আইন বাস্তবায়ন হবে? দেশে যে প্রচলিত আইন আছে এগুলোর যদি ৫% ও বাস্তবায়ন হতো তা হলে দেশের এই অবস্থা হতো না। নতুন সমস্যা আসলে সরকার নতুন আইন করে এটা সরকারের নতুন ভাওতাবাজি। নতুন আইন হলে আগামী ৫ বছরে একটা মামলাও নিষ্পত্তি হবে না। নতুন আইন মানে তাদের ঝুলিয়ে দেওয়া। সবাইকে ধন্যবাদ।

বজলুর রশীদ ফিরোজ : স্বাধীনতার পর থেকে দেশে আজ অবধি কখনো সংবিধান মেনে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়নি, ক্রমাগতভাবে মানুষ তাদের ভোটাধিকার হারিয়েছে। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের আন্দোলনের অংশ হিসেবে এখানে আলোচনা করছি; ছাত্ররাও যৌক্তিক দাবি নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করছে। আমরা বাম জোটের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছি, সরকারও উপায়হীন হয়ে দাবি মানার কথা জানিয়েছে। ছাত্রদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও কেউ সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না, কারণ অতীতে অনেক আশ্বাস দিয়ে তা পূরণ করেনি। তাই তারা বাস্তবায়ন দেখতে চায়।

সংবিধানে উল্লেখ আছে আইনের দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে কিন্তু গত ৪৮ বছরে নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠন করবে সে বিষয়ে কোন নীতিমালাও প্রণয়ন করে নাই আইনও করে নাই। শাসকদলগুলো মনেই করে আইনের দ্বারা যদি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় তাহলে তাদের অনুগত কমিশন হবে না। এই কমিশনও সার্চ কমিটি দিয়ে গঠন করা হয়েছে, যা সংবিধান বর্হিভূত। দেশে তো এখন নির্বাচনের পরিবেশই নাই। বিগত বছরগুলোতে দলীয় সরকারের অধীনে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে তার একটাও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় নাই। নির্বাচনকালীন সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আপেক্ষিক অর্থে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে। এই কমিশনের সময় গত মে মাস থেকে এখন পর্যন্ত যতগুলো সিটি করপোরেশনে নির্বাচন হয়েছে একটাও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নাই। নির্বাচন আসলে একটা কথা খুব প্রচার হয়, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফ্লিল্ড বলতে শুধু আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই দু দলের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বুঝায় না। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড মানে হলো ভোটারেরও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড। চলছে টাকার খেলা ও পেশি শক্তির দৌরাত্ম্য। এখন কী একজন কৃষক, শ্রমিক বা স্কুল কলেজের শিক্ষক প্রার্থী হতে পারবে? না পারবে না। তাহলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কোথায়? লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হতে হলে, প্রার্থী ও ভোটার সবার জন্য সমান সুযোগ থাকতে হবে।

বরিশালে নির্বাচনের আচরণ বিধি লংঘন আপনারা দেখেছেন। ক্ষমতাসীনরা পেশি শক্তির ব্যবহার করেছে আর চরমোনাইয়ের পির ধর্মানুভূতিকে কাজে লাগানোর জন্য ধর্মের ব্যবহার করেছে। আর নির্বাচন কমিশন চাঁদ দেখা কমিশনের মতো সরকার যা চেয়েছে তা করেছে। অর্থাৎ সরকার দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করেছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে এই সংকট মোকাবিলা করতে হবে।

মিজানুর রহমান খান : ১৯৭২ সালে আমরা কী কোন সরকারের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা দিয়েছিলাম নাকি কোন সরকার ব্যবস্থা কায়েম করেছি? আমরা প্রধানমন্ত্রী শাসিত একটা কাঠামো দিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু করেছিলাম। আমরা আসলে কোন দলীয় সরকার করিনি; আমি তথ্য হিসাবে এটা দাবি করছি। সাংবিধানিকভাবে বলা যাবে না যে, বাংলাদেশ একটা দলীয় সরকার দিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিলো। অক্টোবর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রথমে সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছিলো, পরবর্তীতে সরকার কথাটা কেটে কেবিনেট শব্দটি বসানো হয়েছে। ৪ নভেম্বর সংসদে সংবিধান বিল পাশ হয়েছিলো। পরবর্তীতে সরকার শব্দটিও থাকলো না, কেবিনেট শব্দটিও থাকলো না-সেখানে লেখা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী।

১৯৭২ এর সংবিধানে বলা আছে, চাইলে সংসদ ভেঙে দিয়ে ওই সাংসদদের নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার পুনর্গঠিত করা যাবে। এই মুহূর্তে যদি একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয় সেটা সংবিধানিকভাবে বৈধ হবে এবং নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া যাবে। সংবিধানে বিদ্যমান সাংসদদের দিয়ে সরকার গঠন করা যাবে কথাটা শুরুতে ছিলো এখনও আছে।

আমরা একটা প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকারের অধীনে আছি। আমাদের যদি কোনো কিছু চাইতে হয় সেটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে চাইতে হচ্ছে। এখন বাস্তব জীবনেও আমরা দেখি যেকান বিষয় মতামতা, সিদ্ধান্ত আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেই পাই। আমরা এমন একটি জাতি-রাষ্ট্রে বাস করি যেখানে সর্বসম্মতভাবে সংবিধানে নির্দিষ্ট পরিবর্তন এনেও সেটা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। নির্বাচন কাছাকাছি এলে আমরা যে সংস্কারের প্রস্তাব দেই, এটি একটি ভুল পদক্ষেপ কারণ এটি পূরণ হবার নয়। সুশাসন-সুসংবিধান থেকে সুনির্বাচনকে আলাদা করা যাবে না। সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা চলবে আর সুনির্বাচন হবে এটা সম্ভব নয়। এই রাষ্ট্র পদ্ধতিগতভাবে সুশাসন দিতে অপারগ, সাংবিধানিকভাবেই সে তা নিশ্চিত করতে পারবে না। পাঁচ বছর দুঃশাসন চালিয়ে সে ভালো নির্বাচন দিবে সেটা কেমন করে সম্ভব? আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে ব্যাধি সেটা সারিয়ে তোলা তো জরুরি।

তিনি আরও বলেন, আপনাদের নির্বাচনী ভাবনা প্রথাগত রাজনীতি থেকে সুনির্দিষ্ট আলাদা থাকতে হবে। আপনাদের নির্বাচনী প্রস্তাবের সাথে আমি সম্পূর্ণ এক মত। আপনাদের জোটকেও আমি স্বাগত জানাই। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি, না ভোট, নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, প্রার্থীদের সম্পদের বিবরণীর বক্তব্য-এগুলো খুবই দারুন।

আমাদের বিচারের সিদ্ধান্ত একই মামলায় সকালে এক জনের এক রকম হয়েছে বিকেলে আরেক জনের আরেক রকম হয়েছে। আমাদের সংবিধানের যেমন সংস্কার দরকার তেমনি রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা চালু করতে হবে। আপনাদের দাবি সারা বছর ধরে প্রচার করতে হবে, প্রয়োজনে বছরের পর বছর ধরে বলতে হবে। কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এক জনের হাতে সাংবিধানিকভাবে নির্বাহীক্ষমতা কেন্দ্রিভূত, এটা চলতে পারে না। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব আসার পরে এক ঘণ্টায় প্রভিশনাল সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিলো। রাষ্ট্রপতির যা ক্ষমতা তা প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিলো। আমরা কেন ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতা দিয়েছিলাম? আমাদের দেখতে হবে আমরা নির্বাহী ক্ষমতা কী সংসদের হাতে রাখবো না প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখবো সেটা এখন গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। প্রধানমন্ত্রীকে যাতে জবাবদিহি করতে না হয় সে ব্যবস্থা সংবিধানে আছে। আবার

বলা হয়েছে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতি প্রধান। ভারত প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার, নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে। এই জন্য কেউ বলবে না ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চাইতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কম। ফলে আমাদের সবদিক মিলিয়ে একটা দীর্ঘ লড়াই করতে হবে।

কমরেড ফয়জুল হাকিম লালা : বাচ্চারা আজ শ্লোগান তুলছে জাস্টিস। এটা আসলে সর্বস্তরের জনগনেরই কথা। তাই জনগণ এই আন্দোলনে সমর্থন দিচ্ছে। আমরা মনে করি এখানে একটা চরম ফ্যাসিস্ট শাসন চলছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে আপনাদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আপনাদের যে দীর্ঘ প্রস্তাবনা তার সাথে আমাদের দল জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল পুরোপুরি সহমত পোষণ করছে।

মোশারফ হোসেন নান্নু : গত ১৪ সালের নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এই সরকারের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। বাম গণতান্ত্রিক জোট জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন করছে সবার যুক্ত লড়াইয়ে অধিকার আদায় সম্ভব হবে সেই প্রত্যাশা করছি।

মোশরেফা মিশু : পাঁচ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এই নির্বাচন কমিশনার নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারে নাই, তার প্রতি মানুষের কোন ধরনের আস্থা নেই। তাই আমরা নির্বাচনের আগে এই কমিশন ভেঙে আবার নতুন কমিশন গঠনের কথা বলছি। ড. শাহদীন মালিক যেমন বলেছেন-ছোট করে দাবি প্রণয়ন করা। আমরা অবশ্যই দাবিগুলো আরও সুনির্দিষ্ট করে লিফলেট, পোস্টার করে জনগণের কাছে নিয়ে যাবে।

আলমগীর হোসেন দুলাল : পুরো রাষ্ট্রটা চলছে অনিয়মে তাই এই সরকারের অধীনে যে নির্বাচন হয়েছে সবই ছিলো অনিয়ম। বিশ্বপুঁজিবাদ-সামাজ্যবাদের এই সময়ে সুষ্ঠু নির্বাচন আর সম্ভব নয়, দলীয় সরকারের অধীনে তো আরও নয়। বাম গণতান্ত্রিক জোট ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে জোট বদ্ধ হয়েছে। জনগণকে সাথে নিয়ে দেশের সংকট মোকাবেলায় আন্দোলন গড়ে তুলবে।

ফিরোজ আহমেদ : নির্বাচন কমিশন দলের নিবন্ধনের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া অগণতান্ত্রিক। নির্বাচন কমিশনের কাজ কী। একটা দল নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন করবে আর কমিশনার তথ্যগুলো যাচাইবাছাই করবে। কিন্তু তারা উল্টোটা করছে। ভোটের স্বচ্ছতাটাও গুরুত্বপূর্ণ। সময় উপযোগী দাবি নিয়ে আন্দোলন করে বাম গণতান্ত্রিক জোট দাবি আদায় করবে।